৩০-০৮-১৬ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই অবিনাশী বিশ্ব-নাটকের গুপ্ত চিত্রপটের রহস্যকে এইভাবে জানো যে, একমাত্র সঙ্গমযুগেই আত্মিক উন্নতির সোপান (সিঁড়ি) পাওয়া যায়। সত্যযুগ থেকে আবার যা অধোগতির দিকে নামতে থাকে।''

প্রশ্ন :- সেবার মধ্যে সর্ব্বোত্তম সেবা কোনটি আর কে সেই সেবাকার্য করে থাকে ?

উত্তর :- ভারতভূমিকে স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত করা, দৈন্যদশা থেকে রাজকীয় অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া, পতিতকে পবিত্র বানানো -- এটাই হল সর্ব্বোত্তম সেবা। আর এই জাতীয় সেবা একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কেউই তা করতে পারেন না। পূর্বেও বাবা এই মহান সেবা করেছিলেন বলেই তো বাচ্চারা তাকে এত সন্মান করে। তারই নমুনা হিসাবে, সর্ব-প্রথম সোমনাথের মন্দির বানিয়ে তার পূজা-অর্চনা করে থাকে।

গীত :- আখির ওহ্ দিন আয়া আজ .....। (অবশেষে সেই দিন এলো আজ ..... ।)

ওঁম্ শান্তি! মিষ্টি মিষ্টি ঈশ্বরীয় বাচ্চারা, তোমরা যে গীত শুনলে তার মর্মার্থ এই যে, আত্মা শরীরে গুপ্ত ভাবে থাকে, আমরা শুধু শরীরকেই প্রত্যক্ষ করি। আত্মাই দর্শনেন্দ্রিয়ের (চোখ) দ্বারা দেখে থাকে, যদিও তা অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। যদিও তার উপস্থিতি আছে, কিন্তু শরীরের ভিতরে লুক্কায়িত। আর সেই কারণেই আত্মাকে গুপ্ত বলা হয়। অবশ্য আত্মা নিজেই তা বলে, সে নিরাকার। আর এই সাকার দুনিয়ায় এসে তার সেই আকার গুপ্ত হয়ে যায়। আত্মাদের দুনিয়াকে বলা হয় নিরাকার দুনিয়া। সেখানে অবশ্য সে অদৃশ্য নয়। পরমপিতা পরমাত্মাও সেখানেই বাস করেন। তাই তো ওনাকে বলা হয় - 'পরম'। যিনি আত্মাদের থেকেও ওনেক উচ্চ-মার্গের সর্ব্বোচ্চ-আত্মা। যিনি অসীম-পারের পরেও অনেক দূরের জগতে থাকেন - পরমপিতা পরমাত্মা। বাবা জানাচ্ছেন, যেমন তোমরা আত্মারা গুপ্ত অবস্থায় রয়েছো - আমাকেও তাই গুপ্ত অবস্থাতেই আসতে হয়। তফাত হলো, আমার কোনও গর্ভ-জেলের যন্ত্রনা ভুগতে হয় না। আর চিরতরের জন্যই আমার একটাই নাম - 'শিব'। যা পরম্পরায় চলে আসছে। যখন আমি এই ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করি, তখন তার আকারের পরিবর্তন হয় না কিন্তু নামের পরিবর্তন হয়। আর আত্মার ক্ষেত্রে বার বার শরীর ধারন করার কারনে, তার নামও বদল হতে থাকে। আর আমি তো 'শিব' - সব আত্মাদের বাবা, - অর্থাৎ পরম-আত্মা। তোমরা আত্মারা শরীরের ভিতরে গুপ্ত থেকেই, শরীর দ্বারা যে যার কর্তব্য-কর্ম করতে থাকো। আমিও সেরূপে গুপ্তই থাকি। সেই জ্ঞানের পাঠেই রয়েছো তোমরা বাচ্চারা। বুঝতে পারলে, আত্মাকে ঢেকে রেখেছে শরীর। অর্থাৎ আত্মা লুক্কায়িত - শরীরের আকার আছে অর্থাৎ প্রকাশিত। কিন্তু বাবা তো অশরীরী। যদিও বাবাও গুপ্ত, তিনি ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা তাও শুনে থাকেন। তোমাদের আত্মারাও গুপ্ত ভাবে থেকেই, শরীরের ইন্দ্রিয় দ্বারাই শুনে থাকে। সে ভাবেই তোমরা বুঝতে পারো, বাবা ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বাবার আগমনের হেতু, ভারত-ভূমিকে আবার তার দৈন্যদশা থেকে মুক্ত করে, সর্ব্বোত্তোম বানানো। তোমরা তো বর্তমান ভারতের এই গরীব-দৈন্যদশা অবস্থাটাই দেখছো। কিন্তু অন্যদের তো এই তথ্যটা জানাই নেই যে, আমাদের এই ভারত-

ভূমি কত সম্পদশালী ও সর্ব-ক্ষেত্রেই কত উন্নত ছিল। সেক্ষেত্রে তো তোমাদের গর্ববোধ হওয়াই উচিত। একদা এই ভারতই কতই না সম্পদশালী ছিল। যেখানে দুঃখের নাম-গন্ধও ছিল না। সত্যযুগে, আর অন্য কোনও ধর্মও ছিল না - একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্ম ছাড়া, যা আজ কেউই তা জানে না। বিশ্ব-জগতের এই ইতিবৃত্ত ও ভৌগলিক পট-পরিবর্তন -যা অন্যেরা তা জানেই না। কিন্তু তোমরা এখন তা অনেক স্পষ্টরূপেই জেনেছো। তাই তো তোমরা বলতে পারো, আমাদের ভারতভূমিই সবচাইতে সম্পদশালী ছিল, যার আজ এই দৈন্যদশা। বাবা এবার এসেছেন, আবার তাকে সেরূপ সম্পদশালী বানাতে। সত্যযুগের ভারত খুবই সম্পদশালী ছিল, যখন তা দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। যার আজ কোনও চিহ্নই নেই। কিন্তু সেইসব সম্পদ কোথায় গেল, কেন এমনটা হলো, তার খবরও কেউ রাখে না। সাধু-সন্ন্যাসী, ঋষি-মুনিরাও এ সবের যে রচয়িতা ও তাঁর রচনাকে কিছুই জানে না। বাবা নিজে তা জানান, সত্যযুগের সেই সব দেবী-দেবতাদের মধ্যে রচয়িতা ও তার রচনার জ্ঞাণ থাকে না। তারা তো আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানকেও তখন জানে না। তাদেরই যদি সে জ্ঞান না থাকে, আর আমরা তো ক্রম-পতনের চক্রে নামতে নামতে একেবারে রসাতলে এসে পৌঁছেছো, সেখানে রাজ্য-ভোগের সেই সুখের দিনগুলি মনে থাকবে কি করে। আসলে সেটাই তো মূল চিন্তার বিষয়। কিন্তু এখন তো তোমাদের চিন্তা, তোমরা এই তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় আসবে কি করে। আমরা আত্মারা যে নিরাকারী দুনিয়ার বাসিন্দা ছিলাম, সেখান থেকে কিভাবে সেই সুখধামে পৌঁছেছিলাম, সে সবের জ্ঞান সুপ্ত ভাবে আত্মাতে অবশ্যই আছে। এখন আবার তা হাল্কা হাল্কা স্মরণেও আসছে যেহেতু আমরা এখন (চড়তী কলা) উন্নতির সোপানে উঠতে শুরু করেছি। যাকে ৮৪ জন্মের সিঁড়ি বলা হয়। আর এর মধ্যিখানের অবস্থাটাও কি, সে সবও তোমরা অবগত। সব আত্মারাই তো আর সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে যেতে পারবে না। অবিনাশী বিশ্ব-নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী প্রত্যেক এক অভিনয়কারী তাদের নিজের ক্রমিক অনুসারে নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট সময় অনুযায়ী বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে তাদের কর্ম-কর্তব্য সম্পাদন করে। তোমরা বাচ্চারা এখন তো বুঝতে পারছো, দীনবন্ধু-কৃপাসিন্ধু (গরীব নিবাজ) কাকে বলে। দুনিয়ার অন্যান্যরা যা জানেই না। গীতের মাধ্যমে তাই জানলে তোমরা, অবশেষে সেই আকাঙ্খিত দিন এলো আজ ..... যদিও তা ভক্তি-মার্গের। ভগবান স্বয়ং এসে আমাদেরকে ভক্তি-মার্গের সেই শৃঙ্খল-মুক্ত করে সদ্গতির দিশায় নিয়ে চলেছেন - যা এখন বুঝতে পারছি আমরা। রাম-রাজ্য, রাবণ-রাজ্য কি উদ্দেশ্য বলা হয়, তার প্রকৃত অর্থটাই মনুষ্যরা জানে না। তোমরা বাচ্চারা জেনেছো, কল্প-চক্রে বাবা আবার এসে ব্রহ্মা-বাবার শরীরকে আধার বানিয়েছেন। শিববাবা আসেন বলেই তো ওনার জয়ন্তী-ও পালন করা হয়। এমন কিন্তু ঘটে না যে, উনি কৃষ্ণের শরীরকে আধার করেন। বাবা অবশ্য এ কথাও জানান যে, কৃষ্ণই প্রতি কল্পে ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করেন। যিনি কল্পের প্রথম স্থানাধিকারী ছিলেন, বর্তমানে উনিই অন্তিম স্থানে অবস্থিত। "ততত্বম্"। শিববাবা তো অবস্থান করেন, সাধারণের শরীরে। উনি এসে নিজেই তা জানিয়ে দেন, কি পদ্ধতিতে মনুষ্যরা ৮৪ জন্মের চক্র অতিবাহিত করে। বর্তমান সময় কালে কেউ নিজেদেরকে দেবতা ধর্মের বলে ভাবতেই পারে না। যেহেতু তাদের ধারণা- সত্যযুগের আগমনের আরও বহুকাল দেরী। কল্পের আয়ুকেও লাখ লাখ বছর বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে বিশ্ব-নাটকের চিত্রপট তো যথেষ্টই ছোট। যার মধ্যে কোনও ধর্ম ৫০০ বছরের, আবার কোনওটা বা ২৫০০ বছরের ইতিহাস। আর দেবী-দেবতা ধর্মের ৫০০০ বছর। যাদের পরবর্তী অবস্থান স্বর্গ-রাজ্যে। অন্যান্য ধর্ম-রা এর পরে আসতে থাকবে একে একে। দেবতা ধর্ম থেকেই অন্যান্য ধর্মে রূপান্তরিত হতে থাকে, অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে। তারা আবার নিজেদের ধর্মের প্রচার করতে শুরু করবে। বাবা বাচ্চাদেরকে সে কারণেই জানাচ্ছেন, তোমরা বাচ্চারাই তো একদা

(সত্য+ত্রেতা) সমগ্র বিশ্বের অধিকারী ছিলে। তোমরা এখন এটাও বুঝতে পারছে, বাবা স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনা শুরু করে দিয়েছেন। অতএব সেই স্বর্গ-রাজ্যেই তো আমরা বসবাস করবো। সে উদ্দেশ্যেই বাবার থেকে আশীর্ব্বাদী বর্সা অবশ্যই নিতে হবে। তবেই তো ওনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে যে, এরা দেবী-দেবতা ধর্মের যোগ্য হয়েছে। যে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না, সে তো আর যেতে পারবে না। তারা তখন অন্য ধর্মের বলে পরিগণিত হবে। যেখানে তোমরা বাচ্চারা জানতে পেরেছো যে, সেই নতুন দুনিয়া অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যে দেবতারা কত সুখ-শান্তিতে থাকে। সম্পূর্ণ সোনার তৈরী বিশাল বিশাল মহল থাকে তাদের। সোমনাথের মন্দিরেও অনেক সোনা ছিল। যার জুড়ি আর অন্য কোনও মন্দিরই ছিল না। কত দামী দামী হীরে-জহরত ছিল মন্দিরে। বৌদ্ধ বা অন্যদের এত হীরে-জহরতের মহল কিন্তু নেই। তোমাদের বাচ্চাদেরকে যেই বাবা এত উন্নত বানাচ্ছেন, তার কতটুকু মান-সম্মান তোমরা রাখতে পারছো ? যারা ভাল কর্ম করতে থাকে, তার মান-সম্মান অবশ্যই রাখা উচিত। তোমাদের ধারণা তো হয়েছেই, সব থেকে ভাল কাজ এই পতিত-পাবন বাবাই করে থাকেন। তোমাদের আত্মারাও তা উপলব্ধি করে, সবচাইতে উন্নত থেকেও আরও উন্নত সেবা-কর্মগুলি অসীম-বেহদের বাবা এসেই তো তা করেন। আমাদের এই দৈন্যদশা ঘুঁচিয়ে রাজকীয় অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া, ভিখারী থেকে রাজপুত্রে পরিণত করা। পাপীকে পবিত্র বানানো, ইত্যাদি। এদিকে যিনি ভারত-ভূমিকে স্বর্গ-রাজ্য বানাচ্ছেন, তারই কোনও সন্মান রাখি না। তোমরা তো অবগত আছোই, সোমনাথের মন্দিরই সর্ব-প্রথম ও সর্ব্বোকৃষ্ট উন্নত মন্দির। বার বার যাকে লুন্ঠন করা হয়েছে। অথচ, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরকে কিন্তু তা করা হয়নি কখনও। কেবল সোমনাথের মন্দিরকেই লুন্ঠন করা হয়েছে। যেহেতু ভক্তি-মার্গের মন্দিরগুলির মধ্যে তা সবচেয়ে ধনবান ছিল। সেই প্রকারে রাজাদের মধ্যেও প্রতিপত্তির ক্রমানুসার হয়। যে যত বেশী প্রতাপশালী হয়, কম প্রতাপ-শালীরা তাকে বিশেষ মর্যাদা দেয়। রাজ-দরবারেও সেরূপ ক্রমানুসারে বসার আসন নির্দ্দিষ্ট থাকে। বাবার (ব্রহ্মা) স্বয়ং এ সবের অনুভব আছে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার এই দরবার তো পতিত রাজাদের রাজ-দরবার। সেখানে পবিত্র রাজাদের রাজ-দরবার না জানি কত উন্নত হবে। যেখানে তারা তখন কত প্রচুর ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ থাকবে। এতই সম্পত্তিবান হবে যে, তাদের ঘর-দুয়ারও অকল্পনীয় সুন্দরই হবে। তোমাদের মধ্যে এই নিশ্চয়তা অবশ্যই এসেছে যে, বাবা আমাদের সেই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াচ্ছেন, যার ফল-স্বরূপ এখানে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা হতে চলেছে। আমরাই আবার সেই স্বর্গের মহারাজা-মহারাণী হতে চলেছি। আমাদেরই পতন হতে হতে আবার এই একই জায়গায় এসে পৌঁছবো। সেই পতনের প্রথম দিকে শিববাবার পূজারিতে পরিণত হবো আমরাই। সেই শিববাবা, যিনি কখনও আমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী বানিয়ে থাকেন। তাই তাকেই আমরা পূজা করে থাকি। উনিই আমাদেরকে এত সম্পদশালী বানিয়েছিলেন। আজকের সেই ভারত, তার কতই না দৈন্যদশা। পূর্বে তো এমনটি ছিল না। সবাই কত খুশীতেই থাকতো। যে জমির দাম ৫০০ টাকা ছিল, তা আজ আর ৫০০০ টাকাতেও পাওয়া যায় না। কিন্তু, স্বর্গে বা সত্যযুগে জমির কোনও মূল্যই নির্দ্ধারণ করা হয় না। যার যেমন প্রয়োজন, সে ততটাই ব্যাবহার করতে পারে। জমির পর জমি কত প্রচুর জমি সেখানে। মিষ্ট-জলের নদীর ধারে তোমাদের সুদৃশ্য মহল হবে। তবে মনুষ্য সংখ্যা যথেষ্টই কম হবে। প্রকৃতিও তোমার ইশারাতে কাজ করবে। সুন্দর সুন্দর সুস্বাদু ফল, ফুলও পেতে থাকবে। তারই জন্য তো এখন তোমাদের এত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এখন তো খরায় প্রকোপে অন্নের অভাবেও পড়তে হয় তোমাদের। সেই পর্যায়ে এই গীতের মর্মার্থ রোমাঞ্চকর তোমাদের কাছে। তাই তো বাবাকে গরীবের কৃপাসিন্ধু-দীনবন্ধু বলা হয়। এবার তো এর অর্থ অনুধাবন করতে পারলে। উনি কাকে সম্পদশালীতে পরিণত করেন - যে এখানে আসবে তাকেই তো তা করবেন। তোমরা বাচ্চারা তো

জানোই, তোমাদের এই পবিত্র পাবন অবস্থা থেকে পতিত অবস্থায় পৌঁছতে, ৫০০০ বছর সময় লাগে। বাবা এক মূহুর্তেই তোমাদেরকে সেই পতিত অবস্থা থেকে পবিত্র-পাবন বানিয়ে দেন। উঁচু থেকে অতি উঁচুতেও পৌঁছে দেন। মাত্র ১ সেকেন্ডেই যিনি জীবন-মুক্তি দিতে পারেন। তাই তো বাচ্চারা আগ্রহভরে বলে, বাবা আমরা তো আপনারই (বাচ্চা)। বাবাও শান্ত্বনা ও সন্মতি জানিয়ে বলেন, বাচ্চারা তোমরাই তো জগৎ সংসারের অধিকারী। বাচ্চা জন্মাবার সাথে সাথেই তারা তার বাবার সম্পত্তির অধিকারী হয়। বাবার কাছে কতই না খুশীর ব্যাপার এটা। কিন্তু বাচ্চাদের উদাস চেহারা দেখে, বাবার সেই খুশী উধাও হয়ে যায়। এই ঈশ্বরীয় পাঠশালায় বাবা আর বাচ্চারা, সবাই তো আত্মা-স্বরূপ। আমরাই তো স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবো। এই জ্ঞান-পাঠের মাধ্যমে এটা পরিস্কার হলো যে, ৫০০০ বছর পূর্বেও আমরাই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী ছিলাম।বাবা তা যুক্তি সহকারে বুঝিয়েছেন। আমরা যেই শিব-জয়ন্তী উৎসব পালন করি, কিন্তু এটাই তো সেভাবে জানিনা, উনি পূর্বে কখন এই ধরায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব-কাল কোনটা। এ সবের কোনও জ্ঞানই তো আজ আর নেই। বাস্তবিকতায় ভারতের জনসংখ্যা সর্বাধিক হওয়া উচিত। ভারতের ভৌগলিক আয়তনও সব থেকে বড় হওয়া উচিত। যদি যুগ-গুলির আয়ু লাখ লাখ বছরের ধরা হয়, তবে তো সমস্ত দুনিয়াকে একত্রিত করলেও তা ছোটই পড়বে। আর এই লাখ লাখ বছর ধরে এক-একটা যুগের আয়ু হলে, আরও কত অসংখ্য মনুষ্যের অবস্থান ঘটতো, বর্তমানের এই দুনিয়ায়। কিন্তু বাস্তবে তা তো হয়নি। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের সামনে বসে এই যুক্তিগুলিই বোঝান। অন্যেরা তা যখন শোনে, তখন বলে যে, সত্যি তো, এই ধরণের যুক্তিগ্রাহ্য কথা পূর্বে কখনও শুনিনি তো। তা কোনও পুঁথি-পত্র শাস্ত্র ইত্যাদিতেও তো পড়িনি। সত্যি কি আশ্চর্যজনক বাস্তব যুক্তি এগুলি। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন কাল-চক্রের সম্পূর্ণ জ্ঞানটাই আছে। কিন্তু অনেক জন্ম নিতে নিতে তা এখন এই পতিত-আত্মায় এসে পৌঁছেছো - যা সতোপ্রধান অবস্থা থেকে তমোপ্রধানে পৌঁছেছো। তাকেই আবার সতোপ্রধান অবস্থায় আনতে হবে। সেই পাঠের শিক্ষাই তোমাদেরকে শেখানো হচ্ছে। আত্মা তো তার শরীর ইন্দ্রিয় দিয়ে শোনে। সেই আনন্দে শরীর তখন দুলতে থাকে - যখন আত্মা তা শুনতে থাকে। প্রতি কল্পেই আমরা (বি. কে.) আত্মারাই ৮৪ বার জন্ম নিয়ে থাকি। সেক্ষেত্রে ৮৪ প্রকারের লৌকিক মা-বাবার সঙ্গও পেয়েছি অবশ্যই। এটার হিসেবও করা উচিত কি না ! যেখানে আমরা তো তা জানি, কাদের এই ৮৪ বার জন্ম হয়। অনেক আত্মা আবার অনেক কম জন্মও নিয়ে থাকে। নূন্যতম-অধিকতম এসবেরও তো হিসেবের ব্যাপার আছে। বাবা কত সুন্দর ভাবে এগুলি বোঝাচ্ছেন - আর পুঁথি-পত্র, শাস্ত্রাদিতে, যা মনে এসেছে, তাই লিপিবদ্ধ করেছে। অবশ্য অন্যেরা তোমাদের (বি.কে) ক্ষেত্রে ৮৪ জন্মের স্বীকৃতি যদিও বা দেয়, কিন্তু আমার বেলায় তা বলা হয় অসংখ্য বার, অর্থাৎ যা আদিকাল থেকেই চলে আসছে। তারা আবার এও বলে যে, জাগতিক দুনিয়ার যা কিছুই আছে, সব কিছুর মধ্যেই আমি থাকি। যেদিকেই নজর ফেরায় সেদিকেই আমি। সব কিছুতেই কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ। আবার মথুরা বৃন্দাবনে গিয়ে বলে -- কৃষ্ণই সর্বব্যাপী। আবার রাধা-পন্থীরা বলে, সর্বত্র রাধা-ই রাধা। আবার কেউ কেউ তো রাধা-স্বামীও বলে থাকে। কৃষ্ণ-স্বামীর দল আবার আলাদা। তারা রাধাকেই মান্যতা দেয়। তারাও যেদিকে নজর ঘোরায়, কেবল রাধা রাধা-ই দেখে। একে অপরকে রাধা জ্ঞানে দ্যাখে আর বলে, তুমিও রাধা আমিও রাধা। বাবা তাই বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, উনি তো চিরকালই গরীব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কৃপাসিন্ধু-দীনের বন্ধু। যেই ভারত সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল, বর্তমানে তার এতই দৈন্যদশা। যে কারনে এই ভারতেই আসতে হয় আমাকে। যেহেতু এটাও সেই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট, তাই এর সামান্যতমও পরিবর্তন করা যায় না। যা এত লম্বা অবধির। আর সেই অবিনাশী চিত্রপটে যেভাবে তা চিত্রায়িত হয়েছে, তার হুবহু

পুনরাবৃত্ত হয়। তাই সেই নাটকের ধারণা থাকা উচিত। জাগতিক ক্ষেত্রে নাটককে কেবল মনোরঞ্জনের খেলা ভাবা হয়, কিন্তু অসীম পারের এই বেহদের নাটক, যার আদি-মধ্য-অন্তের ঘটনাক্রমকে কেউ জানেই না। তাই তো দীনবন্ধু-কৃপাসিন্ধু (গরীব নিবাজ) নিরাকার ভগবানের এত মান্যতা। কৃষ্ণকেও কিন্তু ততটা মান্যতা দেবে না অবশ্যই। অথচ, কৃষ্ণ কিন্তু সত্যযুগের স্বর্গে প্রথম ধনবান রাজপুত্র হয়ে থাকেন। নিরাকার ভগবানের নিজস্ব শরীর না থাকার কারনে, উনি এসে ওনার বাচ্চাদেরকে ধনবান-সম্পদশালী বানিয়ে দেন। সেই উদ্দেশ্যে তোমাদের রাজ-যোগের শিক্ষা দেন। জাগতিক মনুষ্যরা জাগতিক পাঠে পারদর্শী হয়ে ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি হয়ে অর্থ রোজগার করে। কিন্তু বাবার এই ঈশ্বরীয় পাঠের দ্বারা তোমরা ভবিষ্যতে সাধারণ-মনুষ্য থেকে দেবতা-নারায়ণে পরিগনিত হও। আগামীতে তোমরা দেবতারূপেই জন্ম নেবে। এমনটা কিন্তু মোটেই হয় না যে, সমুদ্র ভেদ করে স্বর্গ উঠে আসে। কৃষ্ণেরও তো সাধারন পদ্ধতিতেই জন্ম হয়। কৃষ্ণের সময়কালে কংস-পুরী বলে কিছুই ছিল না। কৃষ্ণের কতই না গুন-কীর্তন করা হয়ে থাকে। কিন্তু ওনার পিতার কোনও সঠিক নাম-নিশানাই নেই। তবে ওনার পিতা কে ? রজপুত্র যখন, তখন তো অবশ্যই কোনও রাজার পুত্র। তা নিশ্চয় এমন কোনও পবিত্র রাজার ঘরেই তার জন্ম হবে। কারন, এই জাগতিক দুনিয়ায় তো অনেক বড় রাজার ঘরেও জন্ম নিলেও তার সেই সুনাম অবশ্যই হবে না। যেহেতু, বর্তমান দুনিয়ার রাজারাও সবাই পতিত। কৃষ্ণ যখন এই দুনিয়ায় থাকবে, তখন কিন্তু সেখানে কোনও পতিত আত্মা থাকবেই না। যখন সেই পতিত অবস্থার সম্পূর্ণ অবসান হয়ে যায়, তারপরেই কৃষ্ণের সিংহাসন অভিষেক হয় ও রাজ্যভার গ্রহন করেন। সেই সময়কাল থেকেই ওনার সংবৎ বা অব্দ শুরু হয়। একমাত্র তোমরাই সেই পুরো হিসাব লিখতে পারো, কার রাজ্য সময়কাল কখন থেকে কখন। আর তা মনুষ্যরা দেখলে তখন তারা বুঝতে পারবে, কল্পের আয়ু বেশী লম্বা হতেই পারে না। যেহেতু, ৫ হাজার বছরের পুরো হিসেব তাতে মিলে যায়।

আচ্ছা ! মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণে স্নেহ-সুমন, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে ঈশ্বরীয় বাবা জানায় নমস্কার!

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রচয়িতা আর রচনার জ্ঞানকে বুদ্ধিতে রেখে, সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। কেবল একটাই চিন্তা মাথায় রাখতে হবে, আমাকে অবশ্যই সতোপ্রধান হতেই হবে।

২) এই অসীম-অলৌকিক (বেহদের) অবিনাশী নাটককে বুদ্ধিতে ধারণ করে, অপার খুশীতে থাকতে হবে। বাবার মতন সম্মানের অধিকারী হওয়ার লক্ষ্যে, পতিতদের পবিত্র-পাবন বানানোর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে হবে।

বরদান :- সর্ব আত্মার প্রতিই স্নেহের সাম্রাজ্য বিস্তার করে বিশ্ব-রাজ্য অধিকারী হও (ভব)!

যে বাচ্চারা বর্তমান সময়ে সর্বপ্রকার আত্মাদের হৃদয়ে স্নেহের রাজ্য স্থাপন করতে পারে - সে আগামী ভবিষ্যতে বিশ্ব-রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত করে। তাই বর্তমান সময়কালে কারও প্রতি আদেশ চালানো চলবে না। এখন থেকেই নিজেকে বিশ্ব-মহারাজন ভাবা চলবে না। এখন তো বিশ্ব-সেবাধারী হতে হবে, আর সবার প্রতি স্নেহশীল হতে হবে। অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, ভবিষ্যতের ভাগ্য-খাতায় স্নেহের পুণ্য কতটা জমা হয়েছে। বিশ্ব-মহারাজন হওয়ার লক্ষ্যে, শুধু জ্ঞানের বিতরণ করলেই চলবে না, এর জন্য প্রয়োজন সবাইকে স্নেহ আর সহযোগ দেওয়া।

স্লোগান :- যখনই নিজেকে ক্লান্ত বোধ করবে, তখনই নিজের মনের খুশীর ভাবকে জাগিয়ে তুলে আনন্দে থাকার চেষ্টা করবে। এতেই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।